মূলপাতা

কুরবানীর পশুর চামড়ার দাম

Asif Adnan

August 25, 2018

10 MIN READ

চামড়ার দাম নিয়ে কিছু কথা

গত কয়েক বছর ধরে কুরবানীর পশুর চামড়ার দাম ব্যাপকভাবে কমেছে। এ নিয়ে অনেক অভিযোগ, ক্ষোভ। চামড়ার মূল্য কমার এ বিষয়টি মূলত একটি কার্টেল (Cartel) প্রবলেম। বাংলাদেশে সাধারণ এটা পরিচিত "সিন্ডিকেট" নামে । কোন বাজারে এক দল বিক্রেতা মিলে যখন পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, সাপ্লাই কমিয়ে দেয়া বা এধরণের কিছুর কাজের মাধ্যমে নিজেদের প্রফিট বাড়াতে চায়, তখন সেটাকে কার্টেল বা সিন্ডিকেট বলে। সাধারণত কার্টেল করার প্রবণতা বিক্রেতাদের মধ্যে দেখা গেলেও এটা ক্রেতাদের মধ্যেও হয়। এটা একধরণের প্রাইস ও মার্কেট ম্যানিপুলেইশান, সাধারণ যার শিকার হয় সাপ্লাই চেইনের প্রথম ধাপে থাকা ব্যক্তি অথবা খুচরা ক্রেতা (আপনি-আমি)।

বাংলাদেশের পলিসিমেইকারদের ওপর তাদের প্রভাবকে ব্যবহার করে গত কয়েক বছর ধরে লেদার ইন্ডাস্ট্রি সরকারকে দিয়ে কাঁচা চামড়ার এমন দাম নির্ধারন করে আসছে যা সাধারণ অবস্থায় যে দাম হওয়া উচিৎ তার চেয়ে কম (lower than equilibrium price)। এ কাজটা তারা করতে পারছে দুটো কারণে। প্রথমত, সরকারের ওপর তাদের মজবুত প্রভাবের কারণে। অনেক এটাকে বর্তমানে সরকারের সমস্যা বলছেন। তাদের দাবি এ সরকার তাদের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যবসায়ীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এ কাজটা করছে। তবে আমরা যদি গোটা বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, কিছু নির্দিষ্ট ইন্টারেস্ট গ্রুপ এবং লবির বিভিন্নভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নীতিনির্ধারকদের "প্রভাবিত" করার মাধ্যমে নিজেদের পছন্দ মতো আইন পাশ করিয়ে নেয়ার এ ব্যাপারটি, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের একটা ক্লাসিক প্রবলেম। এটা বাংলাদেশে যেমন হয় তেমনি ইউরোপ ও অ্যামেরিকাতেও হয়। বাংলাদেশে হয়তো চামড়া আর কুইক রেন্টাল ওয়ালারা করে ঘুষ দিয়ে করে, আর অ্যামেরিকা টোব্যাকো লবি, ফার্মাসিউটিকাল লবি, গান লবি – এরা করে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে ডোনেশান আর পযিটিভ মিডিয়া কাভারেজ দিয়ে। খুঁটিনাটি আলাদা, মূল প্রসেস এক। সুতরাং এটাকে ব্যাক্তিগতভাবে আমি বর্তমান সরকারের সমস্যা মনে করি না। এটা সিস্টেমিক সমস্যা।

দ্বিতীয়ত, লেদার ইন্ডাস্ট্রি একাজটা করতে পারছে কারণ সরকার মনে করছে এই মূল্য নির্ধারনের নীতির ফলাফল মোটা দাগে ইতিবাচক। লেদার বা লেদার বেইসড প্রোডাক্ট রপ্তানী করে প্রতিবছর বাংলাদেশের আয় হয় ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। যেহেতু কাঁচা চামড়া লেদার ইন্ডাস্ট্রির মূল কাঁচামাল (input of production), তাই দেশের বাজারে চামড়ার দাম কমার অর্থ হল এক্সপোর্টারদের উৎপাদন খরচ কমা। উৎপাদন খরচ কমার অর্থ এক্সপোর্ট মার্কেটে প্রফিট মার্জিন বাড়া। প্রফিট মার্জিন বাড়ার অর্থ বেশি রপ্তানী আয়। সুতরাং ওভারঅল সরকারের দৃষ্টিতে এই প্রাইস কন্ট্রোল বা মূল্য নির্ধারনের ফলাফল ইতিবাচক।

তবে প্রাইস কন্ট্রোল কোন জাদুর কাঠি না। এর অবধারিত ফলাফল হল কেউ উপকৃত হবে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাহলে কাঁচা চামড়ার দাম কমিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ কে?

যারা কুরবানী দেন তারা আসলে ক্ষতিগ্রস্থ না। দাম কমা নিয়ে তারা বেশি থেকে বেশি বিরক্ত। কিন্তু এটা তাদের জন্য বড় কোন সমস্যা না। এই চামড়া তারা নিজেরা ব্যবহার করেন না, প্রক্রিয়াজাত করতে পারেন না, সংরক্ষণও করতে পারেন না। আর কেউ চামড়ার কথা চিন্তা করে পশু কেনেও না। চামড়ার দাম বা চামড়া দান করা -দুটোই তাদের জন্য কুরবানী পশু কেনার সাথে পাওয়া বোনাস, একটা আফটারথট। তাই এই দাম কমে শূন্য হয়ে গেলেও তাদের স্বার্থের কোন ক্ষতি হচ্ছে না। সুতরাং আম জনতা এই দাম কমার কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ না।

আমরা এরই মধ্যে দেখলাম এই দাম কমার কারণে সবচেয়ে বেশি লাভবান হল লেদার ইন্ডাস্ট্রি। লেদার ইন্ডাস্ট্রির লাভ হওয়া

এক অর্থে সরকারেরও লাভ। একদিকে রপ্তানী আয় বাড়তে থাকলে সেটাকে সরকারের সাকসেস স্টোরি হিসেবে প্রচার করা যায়। অন্যদিকে লেদার ইন্ডাস্ট্রির ও লবির কাছ থেকে বিভিন্ন "সুযোগসুবিধা" পাওয়া যায়। আর যদি নির্ভেজাল পুঁজিবাদের চোখে দেখেন তাহলে এতে গোটা অর্থনীতিরও লাভ। রপ্তানী আয় বাড়া, একটা ইন্ডাস্ট্রি বড় হওয়া, চাকরি সৃষ্টি হওয়া, অর্থনীতিতে বিনিয়োগসহ একোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়া – এসবই খুবই পযিটিভ বিষয়।

তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ কে? যে ব্যক্তি কুরবানিদাতার কাছ থেকে চামড়া নিয়ে/কিনে তারপর ব্যাপারীর কাছে বিক্রি করছে, সে এখানে মূল ক্ষতিগ্রস্থ। এবং বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো যেহেতু এ কাজের সাথে যুক্ত তাই তারা এই দাম কমার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ কারণ চামড়া বিক্রির টাকা তাঁদের আয়ের একটি উৎস। কাঁচা চামড়ার দাম কমা ইফেক্টিভলি তাঁদের রেভেনিউ স্ট্রিমকে সংকীর্ণ করে দেয়। অন্যদিকে এই চামড়া সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাত করা কিংবা কাজে লাগানোর কোন পদ্ধতি তাঁদের কাছে নেই। তাঁরা এমন একটি পরিস্থিতিতে আছেন যেখানে দামাদামি করার কোন শক্তি (bargaining power) বা লেভারেজ তাঁদের নেই। তাই চামড়ার এ কেনাবেচায় মাদ্রাসাগুলো প্রাইস টেইকার। ক্রেতা যে দাম অফার করছে তাঁদেরকে সেটাই মেনে নিতে হয়। আর অন্য কোন ক্রেতাও তাঁদের কাছে নেই।

এখন প্রশ্ন হল মাদ্রাসাগুলোর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া নিয়ে সরকারী নীতিনির্ধারক, সমাজের ঐ অংশ যারা নীতিনির্ধারকদের ওপর প্রভাব খাটাতে পারেন আর ব্রডার সোসাইটির মনোভাব কী? বিষয়টা একটু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করা যাক।
নির্ভেজাল পুঁজিবাদের দিক থেকে পুরো পরিস্থিতিতে এভাবে উপস্থাপন করা যায় –

চামড়া বিক্রি থেকে মাদ্রাসাগুলো যে টাকা পায় এটা কোন অর্থনৈতিক কাজে ব্যয় বা বিনিয়োগ হয় না। এটি ব্যবহৃত হয় এ ধরণের সামাজিক-ধর্মীয় (Socio-religous) কাজে। মাদ্রাসাগুলো কুরবানির পশু কেনে না। চামড়াগুলোও তাঁরা কেনেন না। সুতরাং এই চামড়া কম দামে কেনায় তাঁদের ক্ষতির প্রশ্ন কিভাবে আসে? তাছাড়া চামড়াগুলো মাদ্রাসার কাছে গেলে এতে করে কোন বিনিয়োগ হচ্ছে না, কোন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হচ্ছে না, চাকরি সৃষ্টি হচ্ছে না, উৎপাদন বাড়ছে না। এতে করে কেবল মাদ্রাসাগুলোর খরচ নির্বাহ হচ্ছে। একটি সফল, লাভজনক ও সম্ভাবনাময় শিল্পের উৎপাদন খরচ কেন আমি এ জন্য বাড়াবো?

যদি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা কুরবানীর সময় জবাই ও ইত্যাদি কাজে যে শ্রমটা দেন সেটার পারিশ্রমিক চান, তাহলে কুরবানিদাতার কাছ থেকে টাকায় তাঁরা সেটা নিতে পারেন। এতে করে চামড়ার বাজারে কোন প্রভাব পড়লো না, তাঁরাও একটা কম্পেনসেইশান পেলেন আর অতিরিক্ত খরচের দায় চামড়ার বাজারের ওপরও পড়লো না আবার মাদ্রাসাগুলোর ওপর পড়লো না। পড়লো কুরবানিদাতার ওপর যিনি এটাকে খুব বড় একটা খরচ সাধারণত মনে করার কথা না।

আপনার-আমার কাছে শুনতে খারাপ লাগলে একথাগুলো প্রাসঙ্গিক। আমি স্বীকার করি, বিশ্বাস করি মাদ্রাসগুলো সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে। সোশিও-রিলিজিয়াস যে কাজগুলো তাঁরা করেন সেটা সমাজের জন্য দরকার। এবং আমি এটাও মনে করি, বর্তমান সময়ে যখন হক কথা বলা দুর্ঘটনার মতো হয়ে গেছে, তখন মাদ্রাসাগুলোর অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া খুবই দরকার। নইলে আর্থিক মুখাপেক্ষিতা সত্যের ওপর দৃঢ় অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান ও সম্ভাবনাকে আরো অনেক, অনেক দুর্বল করে ফেলবে। কিন্তু এটা আমার চিন্তা। পুঁজিবাদী কেন লাভের চিন্তা না করে মাদ্রাসাকেন্দ্রিক জনসেবার কথা চিন্তা করবে? এটা তো সে পশ্চিমের কাছে মিডিয়া মার্কেটিংও করতে পারবে না।

সমাজে মাদ্রাসাগুলো যে ভূমিকা পালন করে সেটার ব্যাপারে বাংলাদেশেরর সরকার, সুশীল ও নাগরিক সমাজ এবং নীতিনির্ধারকদের মনোভাব কি আমার-আপনার মতোই? ক্যাপিটালিযম, গ্লোবালিযম আর গণতন্ত্রের কাছে কি মাদ্রাসাগুলো কাঙ্ক্ষিত? এরা কি মাদ্রাসাগুলোর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রসারণ চায়? এই দর্শনগুলোর সংজ্ঞা অনুযায়ী মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম কি অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক – কোনভাবে লাভজনক?

প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার চেয়ে আপনারই ভালো দিতে পারবেন।

তাহলে সমাধান কী হতে পারে?

যেমনটা আগে বললাম, সমস্যাটা পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের কাঠামোগত, সিস্টেমিক সমস্যা। কাজেই মূল সমস্যা, যেটা চামড়ার ছাড়া অন্যান্য অনেক বাজার এবং ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষতির কারণ হয়, সেটার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান পেতে হলে সিস্টেমকে বদলাতে হবে। এই সিস্টেম টিকে থাকা অবস্থায় সর্বোচ্চ স্বল্পমেয়াদী কিছু সমাধানের কথা বলা যেতে পারে। আরেকটি করণীয় হল বিকল্প অর্থায়নের ব্যাপারে চিন্তা করা। তবে এখানে আমরা চামড়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী সমাধান নিয়ে কিছুটা চিন্তা করার চেষ্টা করবো।

সাধারণত প্রাইস কন্ট্রোল বা কোন পণ্যের মূল্য নির্ধারন করে দেয়ার পলিসি কার্যকরী হয় না। বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদে এটা টেকে না। বাজারের ডায়ন্যামিক্স এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যখন নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তন করতে হয় এবং এক সময় স্বাভাবিক সাম্যাবস্থার মূল্যে (equilibrium price) বা এর খুব কাছাকাছি নিয়ে আসতে হয়। একটা সাধারণ বাজারে কোন পণ্যের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থার মূল্যের (equilibrium price) চেয়ে দাম কমিয়ে দিলে (যেমনটা চামড়ার বাজারে হয়েছে) সাধারণ কী হয় দেখা যাক –

স্বাভাবিকের চেয়ে কম দাম ঠিক করে দেয়া হলে কম দামের কারণে সেই পণ্যের ক্রেতা বেড়ে যায়। মানুষ কমদামে বেশি করে সে পণ্য কিনতে চায়। অর্থাৎ ডিমান্ড বা চাহিদা বাড়ে। আবার দাম কম হবার কারণে সাপ্লাইয়ার এই পণ্য নিয়ে কাজ করতে অনুৎসাহিত হয়। যেহেতু বাজারদর ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইসের নিচে হওয়াতে তার লাভ কমছে অথবা অনেক ক্ষেত্রে সে লস দিচ্ছে। সাপ্লাই কমে যায়। বাজারে ঐ পণ্যের সাপ্লাইয়ের চেয়ে ডিমান্ড বেশি হয়। যার ফলাফল হল বাজারে এই পণ্যের শর্টেজ (shortage) তৈরি হওয়া। কিছু ক্রেতা কম দামে পণ্য কিনতে পারে, কিন্তু সব ক্রেতার কেনার মতো পণ্য আর বাজারে থাকে না।

বাজারে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে যতো ক্রেতা আছে ততো প্রডাক্ট নেই। বাধ্য হয়েই অল্পসংখ্যক পণ্য কেনার জন্য ক্রেতারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে। তারা মূলত এটা করে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দাম অফার করার মাধ্যমে। এভাবে এক সময় দাম বাড়তে বাড়তে আবারো সাম্যাবস্থায় ফিরে যায়। আর যদি সরকার জোর করে দাম কমিয়ে রাখতে চায়, তখন ক্রেতারা অন্যান্যভাবে প্রতিযোগিতা করে। যেমন লাইনে আগে দাঁড়ানো, আগে আগে দোকানো পৌঁছানো, বিক্রেতার সাথে অন্য কোন চুক্তিতে আসা ইত্যাদি। এমন ক্ষেত্রে সাধারণত ঐ পণ্যের একটি ব্ল্যাকমার্কেটও তৈরি হয়ে যায়।

তবে কুরবানীর সময় ও চামড়ার ব্যাপারটা সাধারণ কেইসের সাথে মেলে না। কারণ কুরবানীর পশুর চামড়ার সাপ্লাই চামড়ার দামের ওপর নির্ভর করে না। এই সাপ্লাই নির্ভর করে কুরবানী দেয়া পশুর সংখ্যার ওপর। আর বছরে কতোসংখ্যক পশু কুরবানী দেওয়া হবে তার ওপর চামড়ার বাজারে দাম কতো – এই প্রশ্নের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। চামড়ার দাম যাই হোক না কেন, মুসলিমদের মধ্যে সামর্থ্যবানরা কুরবানী করবে। কাজেই কুরবানীর পশুর চামড়ার সাপ্লাই চামড়ার বাজারদরের প্রভাব থেকে স্বাধীন। কাঁচাচামড়ার দাম যাই হোক না কেন, কুরবানীর সময় চামড়ার সাপ্লাই তাতে প্রভাবিত হবে না। বরং মানুষের কুরবানী দেয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে দাম কমতে থাকলে, এমনকি শূন্য হয়ে গেলেও এ মৌসুমে চামড়ার সাপ্লাই বাড়বে। এটা একটা স্পেশাল সিচুয়েশান যেটা সাধারণ পণ্যের মার্কেটে হয় না। যেসব মার্কেট মেকানিযম সাম্যবস্থার চেয়ে কম দামকে টেনে সাম্যবস্থায় ফিরিয়ে আনে, এক্ষেত্রে সেগুলো কার্যকর না।

তাহলে করণীয় কী?

লক্ষ্য করুন, এই বিশেষ অবস্থার উদ্ভব একটি নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে। ঈদ-উল-আদ্বহার সময়। বছরের অন্যান্য সময় কিন্তু চামড়া সাপ্লাই বাজারদর থেকে স্বাধীন না। এ সময় চামড়ার বাজার অন্য দশটা পণ্যের বাজারের মতোই। একই সাথে মাথায় রাখুন যে কুরবানীর পশুর চামড়া হল বাংলাদেশের লেদার ইন্ডাস্ট্রির সস্তায় চামড়া পাবার সবচেয়ে বড় সোর্স। লেদার ইন্ডাস্ট্রি বছরে যে

পরিমাণ চামড়া ব্যবহার করে তার প্রায় ৫০% আসে কুরবানীর পশুর চামড়া থেকে। কাজেই আপাতভাবে যদিও মনে হতে পারে যে কুরবানীর পশুর চামড়া কেনাবেচার সময় সব শক্তি তাদের হাতে, বাস্তবতা আসলে এমন না। চামড়ার বাজারদর দ্বারা চামড়ার সাপ্লাই প্রভাবিত না হবার ব্যাপারটা একটা সাময়িক ফেনোমেনা। আর এই মৌসুমটা বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করেন, দীর্ঘমেয়াদে এই চামড়া মাদ্রাসাগুলোর যতোটুকুদরকার তার চেয়ে বেশি দরকার লেদার ইন্ডাস্ট্রির।

তাই লজিকাল সমাধান হল এই সময়টাতে এই চামড়া বিক্রি না করে, কিছুদিন মজুত করে কুরবানী কেন্দ্রিক চামড়া সাপ্লাইয়ের মৌসুমটা শেষ হবার পর চামড়ার বাজার যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে তখন বিক্রি করা। সবচেয়ে ভালো হয় যদি এ চামড়া কাজে লাগানো, প্রক্রিয়াজাত করা এবং এ থেকে উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করা যায়। তবে এ কাজগুলো অতোটা সহজ না, আর স্বল্পমেয়াদে আবশ্যিকও না। মূল লক্ষ্য হল মাদ্রাসাগুলোর "প্রাইস টেইকার" অবস্থা বদলানো। নিজের হাতে কিছু দামাদামির ক্ষমতা (bargaining) আনা। এক অর্থে ক্রেতাদের কার্টেলের বিপরীতে লেদার ইন্ডাস্ট্রির কাছে যারা চামড়া বিক্রি করছে তাঁদের একটি কার্টেল গড়ে তোলা।

এছাড়া পলিসিগত পরিবর্তনের বিষয়টি মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করুন যাতে করে তারা মাদ্রাসাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টি দেখে, এবং anti trust/anti monopoly laws পাশ করার জন্য নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ তৈরি করে। একইসাথে লেদার ইন্ডাস্ট্রির মূল কাচামালের প্রায় ৫০% এর যোগানদাতা কার্টেল ও জনমানুষের সাথে সম্পৃক্ত ও সমর্থিত একটী গোষ্ঠী হিসেবে নীতিনির্ধারকদের ওপর মাদ্রাসাগুলোও ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করতে পারার কথা। তবে এজন্য অবশ্যই জনসম্পৃক্ততা অর্জন করতে হবে এবং পাবলিক ওপিনিয়নকে নিজেদের দিকে আনতে হবে - যেটা আমার মতে বর্তমানে নেই।

বাস্তবতা হল মানুষ কেবল তখনই চামড়া শিল্পের অবস্থান থেকে না দেখে মাদ্রাসগুলোর সামাজিক-ধর্মীয় ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কার্যকরীভাবে মাদ্রাসাগুলোর পক্ষে অবস্থান নেবে যখন তাঁদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হবে ইসলাম। বর্তমানে আমাদের সমাজে এই অবস্থা নেই। তাই এ বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে।